ইউনিট ৯

গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতি

গবাদিপশুর দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করে দেহের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যহত করে রোগের সৃষ্টি করে। কিন্তু দেহে সঠিক রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকলে জীবাণু রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। এই রোগপ্ররিরোধ ক্ষমতা মানুষের মতো গবাদিপশুও দু'ভাবে পেয়ে থাকে। যেমন– ক. প্রাকৃতিক বা অনির্দিষ্ট রোগপ্রতিরোধ ও খ. অর্জিত বা নির্দিষ্ট রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক বা অনির্দিষ্ট প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় পশুর দেহের রক্তের শ্বেত রক্তকণিকার মনোসাইট, নিউট্রোফিল, ইউসিনোফিল ও বেসোফিল; ফুসফুস, প্লিহা ও যকৃতের ম্যাক্রোফেজ নামক রাক্ষুসে কোষ যে কোনো রোগজীবাণু দেহে প্রবেশ করল তা গ্রাস করে মেরে ফেলে। নির্দিষ্ট বা অর্জিত রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থায় রক্তের শ্বেত রক্তকণিকার লিম্ফোসাইট নির্দিষ্ট জীবাণুর সংস্পর্শে এলে প্রতিক্রিয়া করে ও দ্রুত এর বিভিন্ন কার্যকরী বংশধর তৈরির মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীকে ধ্বংস করে এবং ঐ জীবাণুটিকে স্মৃতিতে ধরে রাখে যাতে ভবিষ্যতে আবার আক্রমণ করলে ধ্বংস করতে পারে। লিম্ফোসাটের এ স্মরণশক্তিকেই রোগপ্রতিরোধ বা Immune System বলে। আর এ ব্যবস্থা কাজে লাগানোকেই রোগপ্রতিরোধ বা Immunization বলে।

এই ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত টিকার পরিচিতি ও ব্যবহার; টিকা সংরক্ষণ ও পরিবহণ পদ্ধতি এবং গবাদিপশুতে ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৯.১

বিভিন্ন রোগের টিকার পরিচিতি ও ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাকটেরিয়াল টিকা কী তা বলতে পারবেন।
- এদেশে তৈরি গবাদিপশুর বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়াল টিকার নাম ও ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাইরাল টিকা কী তা লিখতে পারবেন।
- এদেশে তৈরি গবাদিপশুর বিভিন্ন ভাইরাল টিকার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

ব্যাকটেরিয়াল টিকা (Bacterial Vaccine)

নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া বা এর অংশবিশেষ থেকে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগপ্রতিরোধের জন্য যে টিকা তৈরি করা হয় তাকে ব্যাকটেরিয়াল টিকা বলে। এই টিকা প্রয়োগ করা হলে পশুর দেহে নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়াজানিত রোগের বিরুদ্ধে রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গবাদিপশুর ব্যকটেরিয়াল টিকাগুলো এদেশের পরিবেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগপ্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়। বর্তমানে ঢাকার মহাখালীস্থ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (LRI) গবাদিপশুর জন্য তড়কা, গলাফোলা ও বাদলা রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা হয়।

যে কোনো টিকা ব্যবহারের আগে নির্দিষ্ট পশু বা প্রাণীর জন্য তার মাত্রা, প্রয়োগ স্থান, প্রয়োগের প্রথম সময় (বয়স), পুনঃপ্রয়োগের সময় ইত্যাদি ভালো করে জেনে নিতে হবে। এতে টিকাদান বা ভেকসিনেশন (Vaccination) কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। তছাড়া প্রতিটি টিকা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করারও প্রয়োজন হয়। তাই টিকার বোতল বা ভায়ালের (Vial) গায়ে আটানো লেবেল পড়ে নির্দেশ মোতাবেক সংরক্ষণ করতে হবে।

তড়কা রোগের টিকা

পশুসম্পদ অধিদপ্তরের মাহখালীস্থ পশুসম্পদ গবেষণাগারে এ টিকা তৈরি করা হয়। এ টিকা তরল এবং ১০০ মিলি বোতলে সরবরাহ করা হয়। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার রোগপ্রতিরোধর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এ টিকা চামড়ার নিচে ইনজেকশন করে প্রয়োগ করতে হয়।

টিকা ব্যবহারের পূর্বে বোতলের তরল টিকা ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়।

মাত্রাঃ
প্রতিটি গরু/মহিষের জন্য– ১.০ মিলি করে।
প্রতিটি ছাগল/ভেড়ার জন্য– ০.৫ মিলি করে।

গবাদিপশুর ছয় মাস বয়সে প্রথম এ টিকা দিতে হয় এবং বছরে একবার প্রয়োগ করতে হয়। টিকা ৪°-৮° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। টিকা ব্যবহারের পূর্বে বোতলের তরল টিকা ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়। টিকা প্রয়োগের পর প্রয়োগ স্থান কয়েকদিন ফুলে থাকে। টিকা

দেয়ার পর পশুর দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দুগ্ধবতী পশুর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ সাময়িকভাবে কমে যায়। এগুলো টিকার সঠিক কার্যকারিতা নির্দেশ করে।

গলাফোলা রোগের টিকা

পাসচুরেলা মালটুসিডা টাইপ-১ স্ট্রেইনের ব্যাকটেরিয়া নিষ্ক্রিয় করে তেল সহযোগে এ টিকা প্রস্তুত করা হয়। পশুসম্পদ অধিদপ্তরের মহাখালীস্থ পশুসম্পদ গবেষণাগারে এ টিকা উৎপাদন করা হয়। ১০০ মিলি বোতলে এ তরল টিকা সরবরাহ করা হয়। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার গলাফোলা রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক হিসেবে এ টিকা ব্যবহৃত হয়। প্রথমবার এ টিকা ৬ মাস বয়সের পশুকে চামড়ার নিচে ইনজেকশন হিসেবে প্রয়োগ করতে হয় এবং পরবর্তী টিকাগুলো এক বছর পরপর দিতে হয়।

মাত্রাঃ
প্রতিটি গরু/মহিষের জন্য– ২.০ মিলি করে।
প্রতিটি ছাগল/ভেড়ার জন্য– ১.০ মিলি করে।

টিকা ৪°-৮° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। ঘরের তাপমাত্রায় ৩-৫ মিনিট রেখে বোতল ভালো করে ঝাঁকিয়ে সিরিঞ্জে টিকা ভরে ইনজেকশন আকারে প্রয়োগ করতে হবে। টিকা প্রয়োগের ১-২ সপ্তাহের মধ্যে পশু রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং এক বছর পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকে। টিকা প্রয়োগের পর পশুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দুগ্ধবতী পশুর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ সাময়িকভাবে কমে যেতে পারে। এতে টিকা সঠিকভাবে কাজ করেছে বলে ধরে নেয়া যায়।

বাদলা রোগের টিকা

বাদলা রোগের টিকা মৃত *ক্লসিট্রিডিয়াম চোভিয়াই* প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া অ্যালামে থিতিয়ে তৈরি করা হয়। মহাখালীস্থ পশুসম্পদ অধিদপ্তরের পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এ টিকা তৈরি করা হয়। ১০০ বা ৩০০ মাত্রার তরল টিকা বোতলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। তিন মাস থেকে তিন বছর বয়সের গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার বাদলা রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধখ হিসেবে এ টিকা ব্যবহৃত হয়। টিকা প্রথমবার ছয় মাস পরপর টিকা প্রয়োগ করতে হয়। তবে প্রথম ডোজের চায় সপ্তাহ পর দ্বিতীয় ডোজ দিলে পরবর্তী টিকাগুলো এক বছর পরপর দিতে হবে।

মাত্রাঃ
প্রতিটি গরু/মহিষের জন্য- ৫.০ মিলি করে।
প্রতিটি ছাগল/ভেড়ার জন্য- ২.০ মিলি করে।

টিকা ৪°-৮° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। ঘরের তাপমাত্রায় ৩-৫ মিনিট রেখে বোতল ভালো করে ঝাঁকিয়ে সিরিঞ্জে টিকা ভরে ইনজেকশন দিতে হবে। ব্যবহারের জন্য খোলা বোতলের টিকা ২-৩ ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে হবে। অবশিষ্ট টিকা ফ্রিজে রেখে আবার ব্যবহার করা যাবে না। টিকা প্রয়োগের ১-২ সপ্তাহের মধ্যে পশু রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং বুস্টার ডোজ (Booster Dose) দেয়ার পর এক বছর পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকে। টিকা প্রয়োগের পর পশুর দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ সাময়িকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এতে টিকার সঠিক কার্যকারিতা নির্দেশিত হয়।

ভাইরাল টিকা (Viral Vaccine)

বর্তমানে দেশে গবাদিপশুর তিনটি ভাইরাসজনিত রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা হয়। যেমন– ক্ষুরারোগ, গোবসন্ত বা রিন্ডারপেস্ট এবং জলাতঙ্ক রোগের টিকা।

ভাইরাসজনিত রোগপ্রতিরোধের জন্য যে টিকা ব্যবহার করা হয় তাকে ভাইরাল টিকা বা বলা হয়। বর্তমানে দেশে গবাদিপশুর তিনটি ভাইরাসজনিত রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা হয়। যেমন– ক্ষুরারোগ, গোবসন্ত বা রিন্ডারপেস্ট এবং জলাতঙ্ক রোগের টিকা। এছাড়াও ছাগলের পি.পি.আর. রোগ প্রতিরোধকল্পে রিন্ডারপেস্ট টিস্যু কালচার ভেকসিন ব্যবহার করা হচ্ছে। সকল ভাইরাল টিকায় জীবিত ভাইরাস বিদ্যমান তাই এসব টিকা খুব কার্যকর রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তা সত্বেও সঠিক সংরক্ষণ, পরিবহন, মিশ্রণ, মাত্রা, প্রয়োগবিধি, প্রয়োগ স্থান, পশুতে প্রয়োগের বয়স ইত্যাদির ওপর টিকার কার্যকারিতা নির্ভর করে।

ক্ষুরারোগের টিকা

বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের ভাইরাসের টাইপগুলোর মধ্যে সাধারণত ৪টি দিয়ে গবাদিপশু আক্রান্ত হয়। টাইপগুলো হচ্ছে এ, ও, সি এবং এশিয়া-১। তাই চারটি টাইপ একত্রে বা আলাদা কিংবা দুটো অথবা তিনটি টাইপের এ টিকা তৈরি করে একত্রে মিশিয়ে সরবরাহ করা হয়। একটি টাইপ দিয়ে তৈরি টিকাকে মনোভ্যালেন্ট, দু'টি দিয়ে তৈরি টিকাকে বাইভ্যালেন্ট এবং এভাবে ট্রাইভ্যালেন্ট ও কোয়াড্রিভ্যালেন্ট বা পলিভ্যালেন্ট টিকা তৈরি হয়। পশুসম্পদ গবেষণাগারে উপদ্রুত এলাকা থেকে সংগৃহীত ভাইরাস টাইপ দিয়ে টিকা তৈরি করে সরবরাহ করা হয়।

মাত্রাঃ

প্রতিটি গরু/মহিষের জন্য-	মনোভ্যালেট টিকা ৩.০ মিলি
প্রতিটি ছাগল/ভেড়ার জন্য-	মনোভ্যালেট টিকা ১.৫ মিলি, বাইভ্যালেট টিকা ৩.০ মিলি ও পলিভ্যালেন্ট টিকা ৪.০ মিলি করে।

প্রথম টিকা পশুর ২-৩ মাস বয়সে প্রয়োগ করতে হবে। একমাস পর দ্বিতীয় টিকা দিতে হবে এবং প্রথম টিকাদানের ঠিক ছয় মাসে তৃতীয় ডোজ দিতে হবে। প্রতি ছয় মাস পরপর টিকা প্রয়োগ করতে হবে। গবাদিপশুর গলকম্বলের চামড়ার নিচে ইনজেকশন আকারে টিকা প্রয়োগ করতে হবে। এ টিকা ২°-৮° সে. তাপমাত্রায় অন্ধকারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরিবহনের যথাযথ নিয়ম মেনে তা করতে হবে।

গোবসন্ত বা রিন্ডারপেস্ট রোগের টিকা

বর্তমানে জিটিভি এর পরিবর্তে টিসিভি অর্থাৎ গোট টিস্যু কালচার ভেকসিন তৈরি হচ্ছে।

কয়েক বছর পূর্বেও মহাখালীস্থ পশুসম্পদ গবেষণাগারে ছাগলকে রিন্ডারপেস্ট ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত করে মেরে এর প্লীহা থেকে টিকা অর্থাৎ জিটিভি তৈরি করা হতো। পৃথিবীর কোথাও বর্তমানে এ পদ্ধতিতে টিকা তৈরি করা হয় না। বর্তমানে জিটিভি এর পরিবর্তে টিসিভি অর্থাৎ গোট টিস্যু কালচার ভেকসিন তৈরি হচ্ছে। ১০০ মাত্রার টিকা শুষ্ক অবস্থায় সরবরাহ করা হয়। ১০০ মিলি পরিস্রুত পানিতে গুলে এক মিলি মাত্রায় চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হয়। প্রতি ছয় মাস পরপর টিকা দিতে হয়। জিটিভি টিকা ছাগলভেড়াকে দেয়া যেত না। কিন্তু বর্তমানে টিসিভি সব গবাদিপশুকেই দেয়া যায়। ছাগলভেড়ার পি.পি.আর. রোগের প্রতিষেধক টিকা হিসেবে এটি ব্যবহার করা হয়। ছাগলভেড়াকে ০.৫ মিলি টিসিভি চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হয়। টিকা ২°-৮° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ এবং পরিবহন করতে হয়।

জলাতঙ্ক রোগের টিকা

পশুসম্পদ গবেষণাগারে প্রস্তুতি টিকা কুকুর ও গবাদিপশুর জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধকল্পে প্রয়োগ করা হয়। এ গবেষণাগারে দু'প্রকার টিকা তৈরি করা হয়। যথা– ক. লেপ (LEP- Low Embryo Passage) ও খ. হেপ (HEP – High Embryo Passage)। কুকুরের জন্য লেপ এবং গবাদিপশুর জন্য হেপ ব্যবহার করা হয়। হেপ টিকা তিন মাস বয়সের বেশি গবাদিপশুকে দিতে হয়। হিমশুষ্ক এ টিকা একক মাত্রায় ভায়ালে সরবরাহ করা হয়। টিকার সাথে তিন মিলি-এর ডাইলুয়েন্ট টিকা মিশানোর জন্য সরবরাহ করা হয়।

মাত্রাঃ

প্রতিটি গরুর জন্য- ৩.০ মিলি করে।

প্রতিটি বানর/বিড়ালের জন্য- ১.৫ মিলি করে।

এ টিকা মাংসে ইনজেকশন হিসেবে দিতে হয় ও একমাস পর বুস্টার ডোজ এবং প্রতিবছর একবার দিতে হয়। এ টিকা কোনো অবস্থাতেই চামড়ার নিচে ইনজেকশন দেয়া যাবে না। টিকা ২°-৮° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। সময়োউত্তীর্ন টিকা ব্যবহার করা যাবে না। গুলানো টিকা ফ্রিজে রেখে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না। পরিবহনের সকল নিয়মকানুন মেনে পরিবহন করে তবেই সে টিকা ব্যবহার করতে হবে।

সারমর্মঃ

কোনো নির্দিষ্ট জীবাণু বা জীবাণুর অংশবিশেষ নির্দিষ্ট মাত্রায় নির্দিষ্ট শক্তিতে দেহে প্রবেশ করিয়ে যে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা হয় তাকে অর্জিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা বলে। এ কাজে যে জীবাণু বা জীবাণুর অংশ বা অ্যান্টিজেন ব্যবহার করা হয় তাকে টিকা বলে। টিকাকে প্রধানত দু'ভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা- ক. জীবন্ত টিকা যা জীবন্ত রোগজীবাণু কিন্তু রোগ সৃষ্টি করতে অসমর্থ এবং খ. মৃত জীবাণু থেকে প্রস্তুত টিকা। জীবন্ত টিকাকে আদর্শ টিকা বলা হয়। কারণ, এ থেকে সৃষ্ট রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী। মৃত জীবাণু থেকে প্রস্তুত টিকাও রোগপ্ররিরোধে সক্ষম, তবে দীর্ঘস্থায়ী নয়। সময়মতো সংক্রামক রোগের টিকা প্রদান করলে গবাদিপশুকে নির্দিষ্ট রোগের কবল থেকে মুক্ত রাখা যায়। টিকা প্রয়োগ করলে পশুর রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা সুসংহত হয়। খামারের গবাদিপশুকে সুস্থ রাখতে হলে সময়মতো দেশে বিদ্যমান সম্ভাব্য রোগের বিরুদ্ধে টিকা বা প্রতিষেধক প্রয়োগ করতে হবে। এতে প্রাথমিক খরচ আপাতত বেশি হলেও সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে তা থেকে ভালো মুনাফা আসবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গরু ও মহিষের জন্য কী পরিমাণ তড়কা রোগের টিকা প্রয়োগ করতে হয়?
   ক) ১ মি.লি. খ) ২ মি.লি.
   গ) ৩ মি.লি. ঘ) ৪ মি.লি.

২. কত ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় টিকা সংরক্ষণ করতে হয়?
   ক) ৪-৮° সে. খ) ৮-১২° সে.
   গ) ১২-১৬° সে. ঘ) ১৬-২০° সে.

৩. ক্ষুরা রোগের ভাইরাসগুলোর মধ্যে কয়টি দ্বারা গবাদিপশু আক্রান্ত হয়?
   ক) ২ টি খ) ৩ টি
   গ) ৪ টি ঘ) ৫ টি

পাঠ ৯.২

টিকা সংরক্ষণ ও পরিবহন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন ধরনের টিকার সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।
- টিকার পরিবহন পদ্ধতি বলতে ও লিখতে পারবেন।

টিকার সংরক্ষণ পদ্ধতি

এ দেশে চাহিদার তুলনায় টিকার উৎপাদন কিছুটা কম। উৎপাদিত টিকার প্রায় ১৮% সংরক্ষণ, পরিবহন ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে অপচয় হয়। এ অপচয় রোধ করে টিকার যথাযথ ব্যবহার করতে ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে টিকা সংরক্ষণ সম্পর্কে জানতে হবে। প্রতিটি টিকার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংরক্ষণ তাপমাত্রা আছে। ভুল সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষিত টিকা ব্যবহার করলে তা নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে না। টিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া অনুযায়ী টিকাবীজকে দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ক. হিমশুষ্ক ও খ. তরল সাসপেনশন। সাধারণত হিমশুষ্ক টিকা ২°-৮° সে. তাপমাত্রার মধ্যে এবং তরল টিকা ৪°-৮° সে. তাপমাত্রায় ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত রাখতে হয়। সংরক্ষণ ও পরিবহন করে ব্যবহার পর্যন্ত তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রাখার ব্যবস্থাকে কুল-চেইন সিস্টেম (Cool-chain System) বলে। টিকা কোনো সময় ডিপফ্রিজে রাখা যাবে না। রেফ্রিজারেটরে টিকা রাখার পর ফ্রিজের দরজা ঠিকমতো লাগানো আছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ফ্রিজের সুইচ, সকেট, প্লাগ ঠিকমতো লাগানো আছে কি-না এবং ফ্রিজ ঠিকমতো কাজ করছে কি-না তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তড়কা, বাদলা ও গলাফোলা রোগের টিকা ৪°-৮° সে. এবং রিন্ডারপেস্ট টিস্যু কালচার টিকা, ক্ষুরারোগ ও ছাগলের বসন্ড় রোগের টিকা ২°-৪° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়।

পরিবহন

টিকা কুলবক্সর বা ফ্লাক্সের বাইরে বের করে থইং বা সহনীয় তাপমাত্রায় নেয়ার জন্য টিকা বের করার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত কুলবক্সে বা ফ্লাক্সে বরফ থাকতে হবে।

যেহেতু গবাদিপশু সাধারণত গ্রামাঞ্চলেই বেশি পালন করা হয় তাই টিকাবীজ পরিবহনের গুরুত্ব রোগপ্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা বহন করে। তাছাড়া সাধারণত টিকা উৎপাদন কেন্দ্র বা বিক্রয় কেন্দ্র থেকে খামারগুলো বেশ দূরে অবস্থিত। যেহেতু পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা টিকা সংরক্ষণ তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাই পরিবহনকালে সংরক্ষণ তাপমাত্রা ঠিক রাখতে কুলভ্যান, কুলবক্স বা থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ বা কুলবক্সে করে পরিবহণ করতে হয়। তবে এভাবে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত টিকা রাখা যায়। এর থেকে বেশি সময় পরিবহণ করতে হলে পথিমধ্যে আবার বরফ ভরে নিতে হবে। বেশি সময় ধরে পরিবহনের সময় বরফ গলে যেতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে পানি ফেলে আবার কুলবক্স বা থার্মোফ্লাক্সে বরফ ভরে নিতে হবে। টিকা কুলবক্সর বা ফ্লাক্সের বাইরে বের করে থইং বা সহনীয় তাপমাত্রায় নেয়ার জন্য টিকা বের করার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত কুলবক্সে বা ফ্লাক্সে বরফ থাকতে হবে। বরফ ছাড়া বহন করা টিকা

ব্যবহারে কোনো রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে না। তাই গরু, ছাগল, ভেড়াকে এ টিকা প্রদানের পরও একই রোগে এরা আক্রান্ত হতে পারে।

সারমর্মঃ

টিকা সংরক্ষণ ও পরিবহন এবং ব্যবহারের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে প্রতি বছর প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ টিকার অপচয় হয়ে থাকে। এই অপচয় রোধের জন্য সঠিকভাবে টিকা সংরক্ষণ, পরিবহন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রতিবছর শতকরা কতভাগ টিকা সংরক্ষণ, পারিবহন ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণের অভাবে অপচয় হয়?
   ক) ১৮%
   খ) ২৫%
   গ) ৩০%
   ঘ) ৪০%

২. ছাগলের বসন্ত রোগের টিকা কত ডিগ্রী তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়?
   ক) ০-২° সে.
   খ) ২-৪° সে.
   গ) ৮-১২° সে.
   ঘ) ১২-১৮° সে.

৩. টিকাবীজকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?
   ক) ২
   খ) ৩
   গ) ৪
   ঘ) ৫

পাঠ ৯.৩

ওষুধ ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গবাদিপশুর ওষুধ ব্যবহার পদ্ধতি বলতে পারবেন।
- ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ইনজেকশন কী তা বলতে পারবেন।
- ইনজেকশনের মাধ্যমে গবাদিপশুতে ওষুধ প্রয়োগের সুবিধা বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন পথে ইনজেকশন দেয়া ও ওষুধের মাত্রা লিখতে পারবেন।

ওষুধের ব্যবহার পদ্ধতি

ওষুধের সঠিক ব্যবহার রোগ নিরাময় নিশ্চিত করে এবং ওষুধের অপচয় রোধ করে। গাভীর ওষুধ প্রয়োগ সঠিক মাত্রায় হতে হবে। যদি মাত্রা সঠিক না হয় তবে রোগ সারবে না। কম মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগের ফলে আক্রমণকারী জীবাণু ওষুধের বিরুদ্ধে সহনশীলতা অর্জন করবে। পরবর্তীতে ঐ ওষুধ প্রয়োগ করে ঐ রোগ নিরাময় করা যাবে না।

ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতি

যে নিয়মে বা পথে পশুর দেহে ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তাকে ওষুধ প্রয়োগ পথ (Root of Adminstration) বলে। আক্রান্ত পশুর রোগের প্রকৃতি, আক্রান্ত অঙ্গ এবং আক্রমণকারী জীবাণুর ধরনের ওপর ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ভর করে। সঠিকভাবে ওষুধ প্রয়োগের রোগ দ্রুত নিরাময় হয়। ভুল পদ্ধতিতে প্রয়োগ বিপদের আশঙ্কা আছে।

ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি

সাধারণত তিন পদ্ধতিতে গবাদিপশুর দেহে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। যেমন–

ক. উপরি প্রয়োগঃ

নিম্নলিখিতভাবে ওষুধ উপরি প্রয়োগ করা হয়। যথা–

১. প্রলেপঃ যেমন– লোশন, মলম।
২. ডাস্টিংঃ যেমন– ড্রেসিং পাউডার।
৩. স্প্রেঃ যেমন– ঘায়ে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল স্প্রে।
৪. ঢেলে বা গোসল করিয়েঃ যেমন– কীটনাশক পানিতে মিশিয়ে ঢালা বা ডিপ দেয়া।

খ. দেহাভ্যন্তরে নির্দিষ্ট অঙ্গে প্রয়োগঃ

সাধারণত নিম্নলিখিতভাবে গবাদিপশুর অঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। যেমন–

১. মুখে খাওয়ানো যে কোনো পাউডার, তরল, ট্যাবলেট বা বোলাস ইত্যাদি পানিতে গুলে লম্বা গলাওয়ালা বোতল বা স্টমাক টিউবের (Stomach tube) সাহায্যে খাওয়াতে হয়। এছাড়া বলিং গানের (Balling Gun) মাধ্যমেও খাওয়ানো যায়।

২. ইন্ট্রারেকটাল প্রয়োগ (Intra-rectal Adminstration)– এ পদ্ধতিতে রাবার টিউবের সাহায্যে ডুস (Douche) দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করানো হয়।
৩. ইন্ট্রাইউটেরাইন (Intrauterine)– এ পদ্ধতিতে পেসারিজাতীয় ওষুধ যোনিপথে প্রবেশ করানো হয়।
৪. ইন্ট্রামেমারি ইনফিউশন (Intramammary Infusion)– এ পদ্ধতিতে বাটের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ওলানে অ্যান্টিবায়োটিকজাতীয় ওষুধ প্রয়োগ হয়।
৫. শ্বাসের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ– এ পদ্ধতিতে ধুমায়িত ওষুধ শ্বাসনালি বা ফুসফুসের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়।
৬. চোখে ফোটা– এ পদ্ধতিতে চোখে তরল ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।
৭. কানে ফোটা– এটি কানে তরল ওষুধ প্রয়োগ করার পদ্ধতি।

গ. প্যারেনটেরাল ওষুধ প্রয়োগ (Parenteral Administration of Medicine)

ইনজেকশনের (Injection) মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ করাকে প্যারেনটেরাল ওষুধ প্রয়োগ বলে। বিভিন্ন পথে ইনজেকশনের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। এগুলোর মধ্যে তিনটি পথে প্রধানত গবাদিপশুতে ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। যেমন– চামড়ার নিচ (Subcutaneous), মাংশপেশি (Intramuscular), ও শিরা (Intravenous)।

ইনজেকশন কী?

গবাদিপশুর দেহের যে কোনো তন্ত্রে কার্যকরভাবে সরাসরি ওষুধ পৌঁছানোর জন্য সিরিঞ্জ ও সুচের মাধ্যমে প্যারেনটেরাল পথে ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হয়। ইনজেকশন প্রয়োগ করার একটি সিরিঞ্জের কয়েকটি অংশ থাকে। যথা– নজেল বা সুচ ধারক, ব্যারেল ও পিস্টন। পিস্টন আবার গাস্কেট ও প্লাঞ্জার সমন্বয়ে তৈরি। সিরিঞ্জের নজেলে সুচ লাগিয়ে ইনজেকশন পুশ করা হয়।

ইনজেকশনের সুবিধাঃ

১. ওষুধ পশুর দেহে সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়।
২. ওষুধের অপচয় রোধ করা যায়।
৩. নির্দিষ্ট অঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়।
৪. ওষুধের দ্রুততর কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায়।
৫. শরীরের অভ্যন্তরীন স্পর্শকাতর অঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়।
৬. অন্য যে কোনো পথের চেয়ে কম ওষুধে কার্যকরভাবে রোগ নিরাময় করা যায়।

ইনজকশন প্রধানত তিন পথে প্রদান করা হয়। যথা– চামড়ার নিচে, মাংসের মধ্যে এবং শিরার মধ্যে।

ইনজেকশন প্রয়োগ পথঃ

আগেই বলা হয়েছে ইনজকশন প্রধানত তিন পথে প্রদান করা হয়। যথা– চামড়ার নিচে, মাংসের মধ্যে এবং শিরার মধ্যে। এছাড়াও গবাদিপশুতে নির্দিষ্ট প্রয়োজনে ইন্ট্রাপেরিটোনয়াল (Intraperitneal) ও ইন্ট্রাডুরাল (Intraduaral) ইনজেকশন দেয়া হয়ে থাকে।

ক. চামড়ার নিচে ইনজেকশন

সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশনে সিরিঞ্জ ও সুচের সাহায্যে তরল ওষুধ চামড়ার নিচে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত এ পথে অনুত্তেজক বা নন-ইরিটেন্ট ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ওষুধ চামড়ার নিচে ধীরে শোষণ করানোর উদ্দেশ্যে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

ইনজেকশনের স্থান ও ওষুধের মাত্রাঃ পশুর দেহের যেসব স্থানের চামড়া ঢিলা বা ঝুলে থাকে সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন সেসব স্থানের চামড়ার নিচে দেয়া হয়। সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন গবাদিপশুর দেহের যেসব স্থানে দেয়া হয় তা হচ্ছে–

১. গলকম্বল
২. গলার আশপাশ
৩. পেটের নিচে
৪. নাভির আশপাশ
৫. লেজের গোড়া

এই পদ্ধতি সাধারণত কম মাত্রার ওষুধ বা টিকা প্রয়োগে ব্যবহার করা হয়। তবে, বেশি মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ওষুধ একাধিক স্থানে ইনজেকশন করে দিতে হয়।

সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশনের জন্য সুঁচ খাটো ও মোটা হতে হয়। বাম হাতে পশুর চামড়া টেনে ধরে রেখে সুঁচ ঢুকিয়ে সুঁচসহ চামড়া উপরে টানলে সুচের আগা মাংসে না আটকিয়ে এদিকসেদিক নড়াচড়া করলে সুচের আগা চামড়ার নিচে ঢুকছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। এরপর সিরিঞ্জে সুচ লাগিয়ে ওষুধ পুশ করতে হয়।

খ. মাংপেশিতে ইনজেকশন

সিরিঞ্জ ও সুঁচের সাহায্যে তরল ওষুধ পুরু মাংসপেশির মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত এ পদ্ধতিতেও কিছুটা তীব্র প্রকৃতির ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। অপেক্ষাকৃত দ্রুত শোষণ ও কার্যকর করার জন্য এ পদ্ধতিতে ওষুধ পুশ করা হয়। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ওষুধ পুশ করতে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

ইনজেকশনের স্থান ও ওষুধের মাত্রা ঃ পশুর দেহের যেসব স্থানের মাংস পুরু সেসব স্থানের মাংসের মধ্যে ইন্ট্রামাসুকলার ইনজেকশন দেয়া হয়। গবাদিপশুর যেসব স্থানে ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন দেয়া হয় তা হচ্ছে–

১. হিপ জয়েন্ট ও লেজের মধ্যবর্তী গ-ুটিয়াল মাংসে
২. পিছনের পায়ের উরুর মাংসে

এই পদ্ধতি সাধারণত মাঝারি মাত্রার ওষুধ বা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ওষুধ প্রয়োগের ব্যবহার করা হয়। পরপর কয়েকদিন ইনজেকশন দিতে হলে একদিন পশুর দেহের যেপাশে ইনজেকশন দেয়া হবে পরদিন অন্যপাশে দিতে হয়।

ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশনের সুঁচ তুলনামূলকভাবে একটু লম্বা হতে হয়। এই ইনজেকশনের জন্য পশু ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে করে দেহে ওষুধ প্রয়োগের সময় নড়তে না পারে। সুঁচ মাংসে ঢুকিয়ে একটু টেনে পরে সিরিঞ্জের ওষুধ পুশ করলে ওষুধ সহজে এবং দ্রুত প্রবেশ করে।

গ. শিরায় ইনজেকশন

ইন্ট্রাভেনাস বা অন্তঃশিরা ইনজেকশন ড্রিপ বা সিরিঞ্জ ও সুঁচের সাহায্যে তরল ওষুধ শিরার মাধ্যমে সরাসরি রক্তে প্রয়োগ করা হয়। এতে করে ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে রক্তে মিশে কাজ শুরু করে এবং দ্রুত ফল দেয়। সাধারণত এ পদ্ধতিতে তীব্র ও দ্রুত কার্যকর ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। যে কোনো রোগে জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দেয়া হয়। এ পদ্ধতি সাধারণত বেশি মাত্রার ওষুধ বা ড্রিপ ইনফিউশনের কাজে লাগানো হয়।

ইনজেকশনের স্থান ও ওষুধের মাত্রাঃ পশুর দেহে যেসব শিরা বাহির থেকে দেখা যায় সেসব শিরার মধ্যে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দেয়া হয়। গবাদিপশুর যেসব শিরায় ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দেয়া হয় তা হচ্ছে–

১. গলার জুগুলার শিরা
২. কানের শিরা

ইন্ট্রাভেসনাস ইনজেকশনের জন্য নতুন ধারালো সুঁচ নিতে হয়। এ ইনজেকশনের জন্য পশু ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে করে কাজের সময় নড়তে না পারে। সুঁচ ঢুকানোর পূর্বে শিরার রক্ত চলাচল হাতের চাপে বন্ধ করে দিয়ে শিরা ফুলিয়ে নিতে হয়। অতঃপর সাবধানে প্রয়োজনমতো সুঁচ ঢুকিয়ে দিলে শিরার ভিতরে প্রবেশের সাথে সাথে সিরিঞ্জ বা ড্রিপের পাইপে রক্ত দেখা গেলে সুচ শিরার মধ্যে প্রবেশ করেছে বলে ধরে নিতে হবে। এরপর ওষুধ পুশ বা ড্রিপ সেটের নব ঢিলা করলে যদি সুঁচের পাশের চামড়া ফুলে না উঠে এবং সহজে ওষুধ প্রবেশ করে তবে শিরায় ওষুধ প্রবেশ করেছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। শিরায় ওষুধ সবসময় রক্ত স্রোতের বিপরীতে প্রবেশ করেছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। শিরায় ওষুধ সবসময় রক্ত স্রোতের বিপরীতে প্রবেশ করাতে হয়।

এছাড়াও গবাদিপশুকে পেরিটোনাইটিস রোগের চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশনের মাধ্যমে সরাসরি পেরিটোনিয়ামে প্রবেশের জন্য ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল ইনজেকশন দেয়া হয়। কোমরের ব্যাথার চিকিৎসার জন্য এক্সট্রাডুরাল ইনজেকশন দেয়া হয়ে থাকে।

সারমর্মঃ

ওষুধের সুষ্ঠব্যবহার গবাদিপশুর রোগ নিরাময় করে এবং ওষুধের অপচয় রোধ করে। ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, যেমন– উপরি প্রয়োগ প্রসেপ, ডাসিউং, স্প্রে, গোসল, দেহভান্ডরে বিশিষ্ট অঙ্গে প্রয়োগ– মুখে খাওফানো, চোখে ফোট, কানে ফোটা ইত্যাদি। আবার ইনজেকশনের মাধ্যমেও ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। তবে যেভাবেই ওষুধ প্রয়োগ করা হোক না কেন ওষুধের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে গবাদিপশুকে সুস্থ করে চলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সাধারণত কয় পদ্ধতিতে গবাদিপশুর দেহে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়?
   ক) ২ পদ্ধতিতে
   খ) ৩ পদ্ধতিতে
   গ) ৪ পদ্ধতিতে
   ঘ) ৫ পদ্ধতিতে

২. কয়টি পদ্ধতিতে পশুর দেহে ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হয়?
   ক) ৩
   খ) ৪
   গ) ৫
   ঘ) ৬

৩. প্যারেনটেরাল ওষুধ প্রয়োগ কাকে বলে?
   ক) চোখে ফোটা দেয়া
   খ) কানে ফোটা দেয়া
   গ) ইনজেকশনের মাধ্যমে ওষুধ দেয়া
   ঘ) শ্বাসের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৯

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ক্ষুরা রোগের টিকার প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখ করুন।
২. জলাতংক টিকার প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৩. টিকার সংরক্ষণ ও পরিবহন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৪. সংক্ষেপে ওষুধের প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৫. ইনজেকশন কী? ইনজেকশন প্রয়োগের সুবিধাগুলো আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ক্ষুরারোগ কী ?
২. টিকা সংরক্ষণ ও পরিবহনের গুরুত্ব কি ?
৩. কয়েকটি টিকার নাম লিখুন।
৪. জলাতংক কী?

উত্তরমালা ইউনিট ৯

পাঠ ৯.১
১। খ ২। ক ৩। গ
পাঠ ৯.২
১। ক ২। খ ৩। ক
পাঠ ৯.৩
১। খ ২। ক ৩। গ